জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮ তম শাহাদাত বার্ষিকীতে
'জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত আলোচনা সভা
তারিখঃ ১৫ আগস্ট, ২০২৩
স্থানঃ আলোক মিলনায়তন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

"বঙ্গবন্ধু ও প্রান্তজন"

পটভূমিঃ

বিশ্ব মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণিত, বর্বর ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডেরের মধ্যে একটি ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা। তবে এটি শুধু হত্যাকাণ্ড ছিল না। একটি সদ্য স্বাধীন দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রাকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রও ছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ও পরাজিত দেশ, বিদেশি শক্তি এবং ঘাতক চক্র বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যা করেছিল। দিনটি বাঙালির জাতীয় শোক দিবস। প্রতিবছর ১৫ আগস্ট জাতি শোকাতুর হৃদয়ে শ্রদ্ধাভরে জনককে স্মরণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আজ "বঙ্গবন্ধু ও প্রান্তজন" শীর্ষক এই আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ সোমবার মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফুর রহমান। দাদার নাম শেখ আব্দুল হামিদ। শেখ মুজিবুর রহমানের মায়ের নাম সায়েরা খাতুন। তার নানাও শেখ বংশের শেখ আব্দুল মজিদ।

প্রান্তজনের বঙ্গবন্ধুঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কৃষকের সন্তান। বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য-তার গোটা জীবন বিশ্লেষণ করলে এ কথাটি নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাঁর উপলব্ধিতে এটাই ছিল যে পলিগঠিত এই গাঙ্গেয় বদ্বীপের অর্থনীতির প্রাণশক্তি দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের হাতে। পৌনে দুশ বছর ব্রিটিশ শাসনের জাঁতাকলে পড়ে প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর যে ক্ষতি হয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করতে না পারলে বাংলার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় ফিরে আসার পর ১৯৪৯ সালে কারাগারে থাকা অবস্থায় পূর্ববাংলার প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগের (পরে ১৯৫৫ সালের কনভেনশনে সংগঠনের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়) অন্যতম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হওয়ার আগ পর্যন্ত ছাত্ররাজনীতির সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের গঠনের সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পক্ষে আন্দোলনে নেমে গ্রেপ্তার হন এবং জেলে অবস্থান করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতিতে তিনি ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন এবং গণমানুষের সঙ্গে তার সংযোগ সুদৃঢ় হতে থাকে। বাংলার নিপীড়িত কৃষক-শ্রমিক-দিনমজুরসহ সর্বস্তরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে জাগিয়ে তোলার এবং তাদের পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত করার প্রথম সুযোগ আসে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে। এ নির্বাচনের প্রচারণায় তিনি গোটা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল চষে বেড়ান এবং মুসলিম লীগ সরকারের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরেন। ২১ দফাভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী মেনিফেস্টো খুব সতর্কভাবে তৈরি করা হয় পূর্ববাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনুকূলে। ২১ দফার ২, ৩, ৪, ৭, ও ৮ নং দফায় প্রত্যক্ষভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা উল্লেখ করা হয় এবং বাকি ধারাগুলোও এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন সেগুলোও পরোক্ষভাবে তাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ১৯৬৬ সালে প্রণীত ৬ দফা প্রণয়ন করা হয় যা ছিল শোষণ ও বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা রক্ষাকবচ। ৬ দফাকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনা হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ১৯৬৮ সালে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে প্রধান আসামি করে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়; তবে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কারণে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করা সত্ত্বেও তাঁকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হয়নি।

বঙ্গবন্ধুর প্রান্তজনঃ

বঙ্গবন্ধু এর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ৭ই মার্চের ভাষণ। ১৮ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড দীর্ঘ ১১০৮ টি শব্দের এই ভাষণের সর্বশেষ লাইন - এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এখানে মুক্তি বলতে অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি জানানো হয়েছে, শোষণমুক্ত সমাজের দাবি জানানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে একপ্রকার সমাজতন্ত্রকে ধারণ করেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্র ভাবনা শাস্ত্রীয় সমাজতন্ত্র ছিল না। তিনি সমাজতন্ত্রকে তত্ত্বের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে শোষণহীন ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমতা ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ৭ মার্চের ভাষণে যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক তিনি দিয়েছিলেন, সেখানে শ্রমজীবী মানুষের উপর তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁর ভাষণে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করার সময় বলেছিলেন: 'গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে; ২৮ তারিখে কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।' পাহাড়সম প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু গরিব দুখী ও শ্রমজীবী মানুষের কথা চিন্তা করেছেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন ছিল দরিদ্র বাঙালির পক্ষে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সাধনায় সফলতার প্রথম ধাপ। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা পরিলক্ষিত হয় সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে। সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ আছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' ২৮(১) ধারায় রয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।' ২৮(২) ধারায় আছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন।' ২৮(৩) ধারায় আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদে বা বিশ্রামের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।' ২৮(৪) ধারায় উল্লেখ আছে, 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের কোনো অনগ্রসর অংশের প্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।'

শোষণহীন সমাজ গড়ার জন্য বঙ্গবন্ধু এক সুদীর্ঘ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁর মতো করে 'সমাজতন্ত্র' অর্জনের স্বপ্ন দেখতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলে গেছেন, 'আমি বিশ্বের কাছ থেকে সমাজতন্ত্র ধার করতে চাই না। বাংলার মাটিতে এই সমাজতন্ত্র হবে বাংলার মানুষের, যেখানে কোনো শোষণ এবং সম্পদের বৈষম্য থাকবে না। ধনীকে আমি আর ধনী হতে দেব না। কৃষক, শ্রমিক এবং জ্ঞানীরা হবে এই সমাজতন্ত্রের সুবিধাভোগী।' (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৭ জুন ১৯৭২)।

একটি জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেই তার অর্থনৈতিক মুক্তি আসে না। স্বাধীনতা অর্জন করার পরেও একটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বঞ্চনা থাকতে পারে, অসাম্য থাকতে পারে, অন্যায় থাকতে পারে। সুতরাং বঙ্গবন্ধু জানতেন যে বাঙালি জাতির সংগ্রাম শুধু স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে শেষ হবে না, তার অর্থনৈতিক মুক্তিও নিশ্চিত করতে হবে। কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক মুক্তির আবশ্যকীয় শর্ত, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। এই চিত্র মাথায় রেখে চারটি বিষয়কে জাতীয় নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্রকে শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র হিসেবে দেখেননি। তিনি এটাকে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র হিসেবেও দেখেছেন। সুতরাং সম্পদে সবার সমান অধিকার, অর্থনৈতিক সুযোগে সাম্য নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে সব মানুষের সমান কণ্ঠস্বরের কথা তিনি বলেছেন। এ ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সম্পদ ও সুযোগে সম অধিকার এবং সেই সঙ্গে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি। নর-নারীর মধ্যে সাম্যের ব্যাপারটিও সংবিধান ও তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে উঠে এসেছে।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন যে বাংলাদেশে সব মানুষ ধর্ম ও জাতনির্বিশেষে সম অধিকারে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করবে। সেটাই তো বাংলাদেশের ঐতিহ্য। ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি তাই একটি সমতার উপকরণ হিসেবে দেখেছিলেন। একটি বহুধা ধর্মসম্পন্ন

সমাজে সবার অধিকারকে নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ হতেই হবে। ধর্ম সেখানের ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় সত্তার ব্যাপার নয়। বঙ্গবন্ধু বারবার বলেছেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়।'

শোষণের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপসহীন। সারা জীবন তিনি শোষণের বিরুদ্ধে বলেছেন, বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, রুখে দাঁড়িয়েছেন শোষকদের বিরুদ্ধে। শোষণকে তিনি দেখেছেন বঞ্চনার একটি শক্তিশালী খুঁটি হিসেবে, সাম্যের পরিপন্থী হিসেবে এবং মানবাধিকারের সঙ্গে সংগতিহীন হিসেবে। সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই তিনি বলেছেন, 'বিশ্ব আজ দুটো শিবিরে বিভক্ত- শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।'

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর কর্মপরিকল্পনা ও উদ্দ্যোগঃ

রাষ্ট্র গঠনের পরপরই বঙ্গবন্ধুর সামনে ছিল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ। ছিল বৈরী প্রকৃতি আর সীমিত সম্পদে অসাধ্য সাধনের লক্ষ্য। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীন দেশেও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সক্রিয় ছিল। তাদের দুর্নীতি আর অসহযোগিতা যখন স্বাধীনতার সব অর্জনকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল।

বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে মনের গহিনতম তল থেকে উচ্চারণ করেন, 'আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে, পূর্ণ হবে না।'

প্রায় সাড়ে তিন বছরে তিনি যেসব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ছিলেন সেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনের স্বস্তি ফিরিয়ে আনা, তাদের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা না গেলে 'এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে' বলে ১০ জানুয়ারির বিশাল জনসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেন। চব্বিশ বছরের নানামুখী শোষণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে এমনিতেই পূর্ববাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল, তার ওপর মুক্তিযুদ্ধের সময় চালানো ধ্বংসযজ্ঞে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষিব্যবস্থা, ছোট-বড়-মাঝারি শিল্পকারখানা, কুটিরশিল্প ইত্যাদি জীবন সহায়ক শক্তিগুলো প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়ে যায় পাক-হানাদার বাহিনী। কাজেই মানুষের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু গণমানুষের ভাগ্যোন্নয়নের সংগ্রামে আত্মনিবেদিত বঙ্গবন্ধু শক্ত হাতে হাল ধরলেন।

ক. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি দেশকে দাঁড় করানো মোটেও সহজ ছিল না। সে সময় আমাদের অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র আট বিলিয়ন ডলার। আমাদের সঞ্চয়-জিডিপির হার ছিল ৩ শতাংশ। আমাদের রিজার্ভ ছিল শূন্য। বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ৯ শতাংশ। এমন শূন্য হাতে তিনি রওনা হয়েছিলেন সোনার বাংলা গড়ার জন্য। তাঁকে যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছে একেবারে গোড়া থেকে। এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করতে হয়েছে। দেশের ভেতরে বাস্তুচ্যুত ২০ লাখ মানুষের ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে শুরু করে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে ঢেলে সাজাতে হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়েছে। শিক্ষা কমিশন, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন গঠন করেছেন। এসবই করতে হয়েছে প্রতিকূল পরিস্থিতি ও বিরূপ আন্তর্জাতিক পরিবেশ মোকাবিলা করে।

বঙ্গবন্ধু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখবন্ধে লিখেছেন, 'এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ বিকাশের দিক-নির্দেশনা এবং উন্নয়ন অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে স্বল্প সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতি গঠনে আমাদের সবাইকে একাগ্রচিত্তে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যেমনটি আমরা মুক্তিযুদ্ধে সাহস ও উদ্দীপনার সঙ্গে করেছিলাম।'

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোর দিকে নজর দিলেই এই সাক্ষ্য মেলে যে তিনি একটি সুষম, দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই একটি অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে কতটা আন্তরিক ছিলেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো ছিল- (১) দারিদ্র্য দূরীকরণ। বেকারদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, কম মজুরিতে নিযুক্তদের মজুরি বৃদ্ধি, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমতাভিত্তিক আইন ব্যবস্থা। (২) পুনর্নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখা। কৃষি ও শিল্প খাতসহ অর্থনীতির প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে উৎপাদন সামর্থ্য ও সময়োপযোগী মাত্রায় বৃদ্ধি করা। (৩) বাৎসরিক জিডিপি অন্তত ৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধি (বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৩ শতাংশ হারকে অতিক্রম করা) সার্বক্ষণিক চাকরির সংখ্যা ৪১ হাজারে উন্নীতকরণ, অসংগঠিত খাতের শ্রমশক্তিকে সংগঠিত করা, উন্নয়নমুখী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। (৪) খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্যতেল, কেরোসিন এবং চিনির মতো

অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীর প্রাপ্তি ও স্বল্পমূল্য নিশ্চিত করা। (৫) দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা এবং অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে মূল্য কমানো। (৬) মাথাপ্রতি বাৎসরিক আয় অন্তত ২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা। এমনভাবে গতি-নির্ধারণ করা, যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সম্পদের তুলনায় অধিক হারে বাৎসরিক আয় ভোগ করতে পারে। আয় এবং সম্পদের ওপর সিলিং ধার্য করে এবং আদায়কৃত রাজস্বের পুনর্বণ্টন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা। (৭) সমাজতন্ত্রে রূপান্তর প্রচেষ্টায় অর্জিত সাফল্যকে সমন্বিত করা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে সমাজতন্ত্রমুখী করা এবং এই উদ্দেশ্যে সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করা। (৮) দেশীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে পরনির্ভরতা কমিয়ে আনা। রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ এবং দক্ষতার সঙ্গে আমদানি বিকল্প খুঁজে বের করার মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিময়ের ভারসাম্যহীনতা রোধ করা। (৯) খাদ্য-শস্য উৎপাদনে আত্মনির্ভরতা অর্জন, কৃষি ক্ষেত্রে সুযোগ সমপ্রসারণ এবং শহরমুখী শ্রমিক স্রোত ঠেকানোর উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরিভিত্তিক কৃষি ভিত্তি গড়ে তোলা। (১০) জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের একটি উচ্চাভিলাসী গ্রাউন্ডওয়ার্ক সম্পাদন করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতির অঙ্গীকার ও সামাজিক সচেতনতা নিশ্চিত করা, জনসংখ্যা পরিকল্পনার জন্য একটি যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো সৃষ্টি, অনবরত ও নিবিড় মূল্যায়ন এবং গবেষণার ব্যবস্থাসম্পন্ন পরিবার-পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ থেকে ২.৮ শতাংশে কমিয়ে আনা। (১১) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ গৃহায়ণ এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে চিরাচরিতভাবে অবহেলিত সামাজিক ও মানবসম্পদের উন্নয়ন সাধন। (১২) সমগ্র দেশে ভৌগোলিক অঞ্চল নির্বিশেষে সমহারে আয় ও কর্মের সুযোগ সমপ্রসারিত করা, অর্থনৈতিক সুযোগ সমপ্রসারিত অঞ্চলে শ্রমিকের গমনাগমন উৎসাহিত করা।

খ. কৃষির পুনর্গঠন ও সংস্কারঃ এই একটি ক্ষেত্রে যে কী পরিমাণ ক্ষতি সাধন হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় তার সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া দুরূহ। পাক হানাদার বাহিনী ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়, হালের গরু জবাই করে খায়, মজুত গোলার ফসল ও মাঠের ফসল পুড়িয়ে দেয়; সার নেই, বীজ নেই, সেচের পাম্প নেই। কলকারখানা বন্ধ, মেশিনপত্রসহ সব অবকাঠামো ধ্বংস করে দেয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। কৃষক চাষে হাত দিতে পারছে না, শ্রমিক কাজে যেতে পারছে না, খাদ্যশস্যের ব্যাপক ঘাটতি, কলকারখানায় নিত্যপণ্যে উৎপাদন থেমে রয়েছে-আক্ষরিক অর্থেই কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাথায় দিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না সেদিন। বঙ্গবন্ধু দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে একদিকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের রক্ষাকবচ সংবিধান রচনার উদ্যোগ নিলেন, অন্যদিকে প্রথমেই নজর দিলেন কৃষি ও শিল্পকারখানা পুনর্গঠনে, যাতে দেশের বৃহৎ দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্থবির জীবন ক্রমে সচল হতে পারে। তাঁর প্রথম লক্ষ্য ছিল দেশে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে না পারলে অন্যান্য খাতে উন্নয়ন সম্ভব নয়। সে জন্য প্রয়োজন কৃষি উপকরণ নিশ্চিত করা এবং কৃষির আধুনিকীকরণ। প্রথমেই তিনি স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে গণমানুষের কাছে দেয়া অঙ্গীকারগুলো তিনি পূরণ করলেনঃ- ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, পাকিস্তানিদের করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা খারিজ করলেন। তারপর সারা দেশে হ্রাসকৃত মূল্যে ৪০ হাজার লো-লিফট পাওয়ার পাম্প, ২৯০০ গভীর নলকূপ, ৩০০০ অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করলেন; সাধারণ বীজের পাশাপাশি অধিক ফলনশীল ধানবীজ, পাটবীজ, গমবীজ বিতরণ করা হলো; বিশ্ববাজারের চেয়ে অনেক কম মূল্যে সার সরবরাহ করা হলো; উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দিলেন; কৃষকদের মধ্যে ১ লাখ হালের গরু ও ৩০ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ করা হলো; কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব দিলেন; কৃষিবিষয়ক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনে উদ্যোগী হন, গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প চালুর ব্যবস্থা করলেন; খাদ্য মজুতের জন্য ১০০টি গুদাম নির্মাণ করলেন; এ পর্যায়ে ২২ লাখ কৃষক পরিবারকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্বাসন করতে হয়েছিল, যাদের কোনো কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। কৃষকের প্রতি তিনি এতটাই মনোযোগী ছিলেন যে, স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পেতে কিংবা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে সহযোগিতা চাইতে যে দেশেই সফর করেছেন সেখানেই তিনি কৃষির আধুনিক উপকরণ পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সবচেয়ে বেশি।

গ. কলকারখানা জাতীয়করণঃ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ কলকারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিরা পূর্ববাংলার মেহনতি দরিদ্র শ্রমিকদের নামমাত্র পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নিত। সে ধারাবাহিকতা যাতে চলতে না পারে সে জন্য তিনি বৃহৎ ও মাঝারি মাত্রার শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করেন। যাতে শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরি পায় এবং কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া কৃষি খাতে উৎপাদিত শিল্প পণ্যের ব্যবহার যাতে নিশ্চিত হয় সেটাও বিবেচনায় ছিল। কৃষি উৎপাদন ও কলকারখানার উৎপাদন সমান্তরাল না হলে উন্নয়নের গতিধারা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। ৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী মেনিফেস্টোতেও জাতীকরণের কর্মসূচি ছিল, ৬-দফাতে ছিল, ৭০ নির্বাচনে ছাত্রদের ১১ দফায়ও ছিল। কাজেই জাতীয়করণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে তিনি বিলম্ব করেননি।

ঘ. সমবায়ঃ বঙ্গবন্ধু বাইরের দেশ থেকে সাহায্য এনে দেশের অভাব সাময়িকভাবে দূর করার পথ পরিহার করে স্থায়ী পথ হিসেবে সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন। তাই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করতে গণমুখী সমবায়ের ডাক দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে।। এর পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।' দেশের সিংহভাগ গ্রামের জনগণ, এবং দরিদ্র। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে একমাত্র সমবায়কে অবলম্বন হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন। তাই রাষ্ট্রের মালিকানার নীতি বিষয়ে সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র মালিকানাব্যবস্থা হবে প্রথমত রাষ্ট্রীয় মালিকানা, দ্বিতীয়ত. সমবায়ী মালিকানা, তৃতীয়ত. ব্যক্তিগত মালিকানা। মালিকানায় সমবায়কে দ্বিতীয় অন্যতম খাত হিসেবে স্থান দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

ঙ. সমাজসেবা অধিদপ্তরঃ বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সমাজসেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম প্রচলন করে বঙ্গবন্ধু দেশে ও সমসাময়িক বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেন। দারিদ্র্য বিমোচন ও শোষণমুক্ত দেশ গড়ার প্রত্যয়ে ১৯৭২ সালেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ-শিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিত্যক্ত শিশু অধ্যাদেশ, ১৯৭২ জারি; বাংলাদেশে 'SOS শিশু পল্লী' স্থাপনে চুক্তি সম্পাদন, অনাথ শিশুদের জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় দত্তক প্রদান প্রকল্প গ্রহণ, বীরাঙ্গনা নারীদের পুনর্বাসনে ইস্কাটন গার্ডেন রোডে অবস্থিত তৎকালীন সমাজকল্যাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারী পুনর্বাসন বোর্ড স্থাপন, এতিম শিশু ও দুস্থ নারীদের জন্য প্রতিটি ১০০ আসন বিশিষ্ট ৫৬টি কেয়ার এন্ড প্রোটেকশন সেন্টার (CPC) স্থাপন করেন যা বর্তমানে 'সরকারি শিশু পরিবার' হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী, দুস্থ ও অসহায় জনগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতায় আনয়নের জন্য সংবিধানে ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করেন। ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন, ৪৭টি বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর জন্য সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন, পল্লী পরিবার ও শিশু কল্যাণ কার্যক্রম চালুকরণ, পল্লীকেন্দ্রিক সমাজকল্যাণ কর্মসূচি, ভিক্ষুক পুনর্বাসনে আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ, শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণার্থে পৃথক কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠার সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ ও সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরকে সমাজকল্যাণ বিভাগে রূপান্তর করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন থেকে শুরু করে শাহাদাতবরণের পূর্ব পর্যন্ত ০৩ বছর ০৭ মাস ০৫ দিন সময় পেলেও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবদ্দশায় ৫৩টি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়।

চ. নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নঃ নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা পরিলক্ষিত হয়। সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ আছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' ২৮(১) ধারায় রয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।' ২৮(২) ধারায় আছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন।' ২৮(৩) ধারায় আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদে বা বিশ্রামের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।' ২৮(৪) ধারায় উল্লেখ আছে, 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের কোনো অনগ্রসর অংশের প্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।' ৬৫(৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত হয়েছে এবং ধারার অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলে দেশের বাইরে নারী উন্নয়নের যে আন্দোলন চলছিল তার মূলস্রোতধারায় বাংলাদেশ যুক্ত হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু নির্যাতনের শিকার নারীদের 'বীরাঙ্গনা' খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। 'বীরাঙ্গনা' অর্থ 'বীরনারী'। নির্যাতনের শিকার নারীদের পুনর্বাসন এবং আবাসনের জন্য তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড'। তিনি মহিলা সংস্থার এক ভাষণে বীরাঙ্গণাদের বাবার নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ঠিকানা ধানমন্ডি ৩২ লেখার জন্য বলেন।

নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালে বোর্ডকে পুনর্গঠিত করে সংসদের একটি অ্যাক্টের মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করা হয়। কর্মজীবী নারীদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের চিকিৎসা এবং তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তিপ্রথা চালু করা হয়।

রাজনীতি ও প্রশাসনে নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার গ্রহণ করে। সরকারি চাকরিতে মেয়েদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে সব ক্ষেত্রে মেয়েদের

অংশগ্রহণ অবারিত করে ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে দুজন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৭৪ সালে একজন নারীকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়।

বাংলার নারীদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নারী সংগঠন "জাতীয় মহিলা সংস্থা"র ভিত্তি রচনা করেন। শিশু ও কিশোরীদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও নৈতিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তান গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশনকে ঢেলে সাজান।

উপসংহারঃ

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন প্রগতির পথনির্দেশক। বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার। যেখানে পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে শ্রমিক, কৃষক, দরিদ্র মানুষ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক দর্শনে জমিদারি বা সামন্তবাদী প্রথা ছিল না। ছিল শ্রমিক কৃষক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে শোষণ চলছে সেটা কমিয়ে আনা। তিনি ধনী-গরিব, শহর-গ্রামের ব্যবধান কমাতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের পরে ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। আমার আর হিমালয় দেখার প্রয়োজন নেই।' মাত্র সাড়ে তিনবছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ তথা তাঁর সোনার বাংলা গড়ার নেতৃত্ব দিয়েছেন।

দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জসগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন ও অধিকারের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁর কর্ম, নীতি, আদর্শ ও দর্শন বেঁচে থাকবে অনন্তকাল। তাঁর উন্নয়ন দর্শনকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সোনার বাংলায় কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে শোকের মাসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

ওয়াসিউর রহমান তন্ময়
কো-অর্ডিনেটর, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

তথ্যসূত্রঃ

1. https://www.bbc.com/bengali/news-59643194
2. https://bangla.thedailystar.net/node/131431
3. https://www.deshrupantor.com/first-page/2023/03/07/412712
4. https://www.jagonews24.com/country/news/565956
5. https://www.jugantor.com/todays-paper/august-mourning /583973
6. http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_2858/Unit-10.pdf
7. https://www.elcop.org/2023/04/12/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6
8. https://www.bb.org.bd/recentupcoming/news/aug032015newsb1277.pdf
9. https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%87
10. https://www.bangabandhuonline.org/12890/